Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ নুরুজ্জামান

রোলঃ 227011370

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ নুরুজ্জামান

রোলঃ 227011370

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শেখ নুরুজ্জামান, আইডিঃ 227011370 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

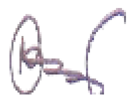

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

শেখ নুরুজ্জামান

আইডিঃ 227011370

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা 5

রোযা 5

পূর্ববর্তী ধর্মমতে রোযা 6

ইসলামী শরীয়তে রোযা ও তার পর্যায়ক্রম 7

রোযার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপকারিতা ও যৌক্তিকতা 9

রোযায় করণীয় 24

রোযার গুরুত্ব 25

রোযার ফযিলত 27

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা 36

উপসংহার 41

উপক্রমণিকা

হিজরী সনের নবম মাসের নাম- রমযানুল মুবারক। এ মাসের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বলার অপেক্ষা রাখে না। এ মাস আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অধিক থেকে অধিকতর নৈকট্য লাভের উত্তম সময়, পরকালীন পাথেয় অর্জনের উৎকৃষ্ট মৌসুম। ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার এবং তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির ভরা বসন্ত। মুমিন বান্দার জন্য রমযান মাস আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামত। তিনি এই মাসের প্রতিটি দিবস-রজনীতে দান করেছেন মুষলধারা বৃষ্টির মত অশেষ খায়ের-বরকত এবং অফুরন্ত কল্যাণ। মুমিনের কর্তব্য হলো- এই মহা নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হওয়া এবং এর কদর করা।
রমযান মাসের পুরোটাই রোযা পালন ও বেশি বেশি ইবাদত করে কাটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মাসে বান্দা পার্থিব সকল চাহিদা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দয়া ও রহমত লাভ করবে, অতীতের সকল পাপাচার থেকে ক্ষমা চেয়ে নতুনভাবে ঈমানী জিন্দেগীর উত্তাপ গ্রহণ করবে, তাকওয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে পুরো বছরের ইবাদত ও ইতায়াতের শক্তি সঞ্চয় করবে, চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-সাধনায় আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পিত করবে- এটি হচ্ছে মুমিনের আনন্দ।

রোযা

রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। অভিধানে صيام (সওম)-এর সাধারণ অর্থ হলো- বিরত থাকা। আর, এ জন্যই কথা বলা থেকে যে বিরত থাকে; অর্থাৎ চুপ ও নিস্তব্ধ থাকে তাকে صائم (সায়েম) বলা হয়। ফারসি, উর্দু, হিন্দি ও বাংলায় সওমকে 'রোযা' বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় সওম হলো- প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও নিয়ত সহকারে শরিয়ত-নির্ধারিত বিধিনিষেধ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং, রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকিম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর ওপর পূর্ণ রমযানে রোযা রাখা ফরয।

পূর্ববর্তী ধর্মমতে রোযা

মানুষের জন্য রমাযানের রোযাই প্রথম রোযা নয়। কারণ, রোযা হলো এমন ইবাদত, যা আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই নিজের বান্দার জন্য ফরয করেছেন। তিনি কুরআন মাজীদে বলেন-

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পারো। [কুরআনুল কারীম ২/১৮৩]

এ থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য রোযা ফরয ছিল। অবশ্য ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী ধর্মের পূর্বের ধর্মাবলম্বী মানুষরা কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে রোযা পালন করত, তা নির্দিষ্টরূপে জানা যায় না। তবে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জিনিস থেকে বিরত থেকে রোযা পালন করত। তাওরাত ও ইঞ্জীলের বর্তমান সংস্কারগুলো থেকেও জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা রোযাকে তাঁর পূর্ববর্তী বান্দাদের ওপর ফরয করেছিলেন।

বুখারী-মুসলিমের একটি হাদীসে পাওয়া যায় যে, মহানবী (স) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছো?" ইয়াহুদীরা বলল, 'এ এক মহান দিন। এ দিনে আল্লাহ মূসা ও তাঁর কওমকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন এবং ফিরআউন ও তার কওমকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। তাই, মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।'

এ কথা শুনে মহানবী (স) বললেন, "মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমরা অধিক হকদার।' ' সুতরাং, তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। অবশ্য আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান) ও মুসলিমদের রোযার মাঝে একটি পার্থক্য এই যে- আহলে কিতাবরা সেহরী খায় না; কিন্তু, মুসলিমরা খায়। তদনুরূপ আহলে কিতাবরা ইফতার করতে দেরী করে। পক্ষান্তরে, মুসলিমরা সূর্য ডোবামাত্র তড়িঘড়ি ইফতার করে থাকে।

ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে বলা হয়েছে যে, জল, বায়ু, জাতি, ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতা ভেদে রোজার নিয়ম-পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও এমন কোনো ধর্মের নাম উল্লেখ করা কঠিন, যাহার ধর্মীয় বিধানে রোযার আবশ্যকতা স্বীকার করা হয় নাই। যাই হোক না কেন, এই খবরের মাঝে মুসলিমদের জন্য রয়েছে সান্ত্বনা ও আশ্বাস। কারণ, শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপরেই

নয়; বরং পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপরেই রোযা ফরয ছিল। আর সে মনে করেই মুসলিমদের ওপরেও রোযার ভার অনেক হাল্কা হয়ে যায়। কারণ, মুসলিম যখন জানতে পারে যে, এই রোযা রাখার পথ হলো পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও তাঁদের অনুগামী নেক লোকদের, তখন সে এই পথ অবলম্বন করে আনন্দবোধ করে এবং রোযার কোনো কষ্টকেই সে নিজের জন্য ভারী মনে করে না।

ইসলামী শরীয়তে রোযা ও তার পর্যায়ক্রম

মহাবিজ্ঞান ও হিকমতময় মহান আল্লাহর একটি হিকমত ও অনুগ্রহ এই যে, তিনি বান্দার ওপর যে আদেশ-নিষেধ আরোপ করেছেন তার মধ্যে বহু বিষয়কেই পর্যায় অনুক্রমে ধীরে ধীরে ফরয অথবা হারাম করেছেন। অনুরূপ তাঁর এক ফরয হলো রোযা; যা তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু করে ফরয করেছেন। যেমন-

প্রথম পর্যায়: প্রিয় নবী (স) প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা পালন করতেন। আর এ দেখে সাহাবাগণ তাঁর অনুসরণে ঐ রোযা রাখতেন। যাতে করে রোযার অভ্যাস তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্যায়: কুরাইশ দল জাহেলী যুগে আশূরার রোযা রাখত। অত:পর রাসুল (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলে মূসা (আ)-এর অনুকরণে তাঁর স্মৃতি পালন করে আশূরার দিনে খুব গুরুত্বের সাথে রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকেও এ রোযা রাখতে আদেশ করলেন। তখন এ রোযা রাখা ফরয ছিল।

তৃতীয় পর্যায়: অতঃপর রোযার বিধান নিয়ে কুরআন কারীমে আয়াত অবতীর্ণ হলো। কিন্তু, শুরুতে তখনও রোযা পূর্ণ আকারে ফরয ছিল না। যার ইচ্ছা সে রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে না রেখে মিসকীনকে খাদ্য দান করত। তবে, রোযা রাখাটাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল-

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখো, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। [কুরআনুল কারীম ২/১৮৪]

চতুর্থ পর্যায়: অত:পর ২য় হিজরী সনের শা' বান মাসের ২য় তারিখ সোমবারে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ভারপ্রাপ্ত মুসলিমের পক্ষে পূর্ণ রমাযান মাসের রোযা ফরয করা হলো। এ ব্যাপারে

মহান আল্লাহ বলেন- "রমাযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।" [কুরআনুল কারীম ২/১৮৫]

সুতরাং সামর্থ্যবান ভারপ্রাপ্ত (জ্ঞানসম্পন্ন সাবালক) গৃহবাসীর জন্য মিসকীনকে খাদ্যদানের বিধান রহিত হয়ে গেলো এবং বৃদ্ধ ও চিররোগীর জন্য তা বহাল রাখা হলো। অনুরূপ (কিছু উলামার মতে) এ বিধান গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার জন্যও বহাল করা হলো; যারা গর্ভকালে বা দুগ্ধদান কালে রোযা রাখলে তার সন্তানের বিশেষ ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করে।

মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত এই ছিল যে- রোযার বহু কষ্টভার তিনি লাঘব করে দিয়েছেন। যেমন- শুরুর দিকে এ রোযা ফরয ছিল এশার নামায বা রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর থেকে পর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ, রাত্রে একবার ঘুমিয়ে পড়লে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হারাম হয়ে যেত। এতে মুসলিমরা বড় কষ্টবোধ করতে লাগলেন। সময় লম্বা থাকার কারণে তাঁরা বড় দুর্বল হয়ে পড়তেন। অতঃপর মহান আল্লাহর তরফ থেকে সে ভার হাল্কা করা হলো। পরিশেষে, ফযর উদয়কাল থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত হলো রোযা রাখার সময়।

আনসার গোত্রের সিরমাহ নামক এক ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতেন। একদিন তিনি বাড়ি ফিরে এসে এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কোন প্রকার পানাহার না করেই তাঁর ফযর হয়ে গেল। সুতরাং, এ অবস্থাতেই পরদিন রোযা রাখলেন। রাসূল (স) তাঁকে সেই কঠিন দুর্বল ও ক্লিষ্ট অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার! আমি তোমাকে বড় দুর্বল দেখছি যে?" তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি গতকাল কাজ করার পর যখন এলাম তখন এলাম। তারপর (পরিশ্রান্ত হয়ে) শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে গেলাম। তারপর ফযর হয়ে গেলে আবার রোযা রেখে নিলাম।'

উমর (রা) এক রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর উঠে স্ত্রী-মিলন করে ফেললেন। তিনি মহানবী (স)-এর নিকট এসে ঘটনা উল্লেখ করলেন। অত:পর এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হলো- "রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্ম-প্রতারণা করছো। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব, এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান, শবেকদর, সকল বৈধ বস্তু বা আল্লাহর তরফ থেকে কোনো কিছুর ব্যাপারে অব্যাহতি) লিখে রেখেছেন তা কামনা করো। আর, তোমরা পানাহার করো; যতক্ষণ রাত্রির কালো রেখা হতে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না পায়। অত:পর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।" [কুরআনুল কারীম ২/১৮৭]

রোযার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপকারিতা ও যৌক্তিকতা

মহান আল্লাহর ৯৯ এর অধিক সুন্দর নামাবলীর অন্যতম নাম হলো 'আল-হাকীম।' 'আল-হাকীম' অর্থ হিকমত-ওয়ালা, বিজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। আর হিকমত ও প্রজ্ঞা হল সর্বকর্ম যথাযোগ্যভাবে নৈপুণ্যের সাথে সম্পাদন করা। মহান আল্লাহর এই নামের দাবী এই যে- তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন অথবা মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটার পশ্চাতে আছে পরিপূর্ণ যুক্তি ও হিকমত; তা কেউ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম।

যে রোযা আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর ফরয ও বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাঝে রয়েছে অভাবনীয় যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা। যেমন-

১। রোযা হলো এমন এক ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সে প্রকৃতিগতভাবে যে জিনিস ভালোবাসে তা বর্জন করে; বর্জন করে সকল প্রকার পানাহার ও যৌনক্রিয়া। আর এর মাধ্যমে সে নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে। আশা করে পরকালের সাফল্য ও বেহেশত-লাভ। এতে এ কথাই স্পষ্ট হয় যে- সে নিজের প্রিয় বস্তুর ওপর প্রভুর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেয় এবং ইহকালের জীবনের ওপর পরকালের জীবনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।

২। রোযাদার যথানিয়মে রোযা পালন করলে রোযা তাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বানাতে সহায়ক হয়। তার জীবন পথে তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো বিচ্ছুরিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।" (কুরআনুল কারীম ২/১৮৩)

সুতরাং রোযাদার রোযা রেখে তার জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কর্মে 'তাকওয়া' আনবে- এটাই বাঞ্ছিত। আর 'তাকওয়া' হলো সেই আল্লাহ-ভীতির নাম, যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর সকল আদেশ যথাসাধ্য পালন করে চলবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সুদূরে থাকবে। বলা বাহুল্য, এটাই হলো রোযার মহান উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। পানাহার ও যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষকে বৃথা কষ্ট দেওয়া রোযার উদ্দেশ্য নয়। প্রিয় নবী (স) বলেন- "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও তার ওপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"

৩। রোযা আত্মাকে তরবিয়ত দান করে, চরিত্রকে সভ্য ও আদর্শভিত্তিক করে গড়ে তোলে এবং রোযাদারের আচরণে উৎকৃষ্টতার স্থায়িত্ব আনয়ন করে। মুসলিমের স্বভাব-প্রকৃতিতে রোযা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রোযার সংশোধনী বার্তা তার হৃদয়-মনে তাসীর রেখে

যায়। রোযাদারের অন্তরে এমন জাগরণ সৃষ্টি করে এবং তার মনের দুয়ারে এমন অতন্দ্র প্রহরী খাড়া করে দেয় যে, সে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় এবং এই প্রহরীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনো নৈতিকতা-বিরোধী কর্ম করতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে পারে না।
এটা কি করে হতে পারে যে, রোযাদার তার প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে, অথচ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলবে? নিজের রোযায় আন্তরিকতা রাখবে, অথচ নিজ সমাজের সঙ্গে ধোঁকাবাজি ও কপটতা প্রদর্শন করবে? ইখলাস ও আন্তরিকতা একটি সামগ্রিক বস্তু; যা ভাগাভাগি হয় না। যার সর্বোচ্চ পর্যায় ও সারাংশ হলো- আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। সুতরাং, যে ব্যক্তির আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা থাকবে, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব যে, সে মানুষকে ধোকা দেবে, আমানতে খেয়ানত করবে, অপরকে ঠকিয়ে খাবে, চুরি করবে, যুলম করবে অথবা অপরকে কষ্ট দেবে। পক্ষান্তরে, যদি কারও চক্রান্তে পড়ে বা ভুলক্রমে এ ধরনের কোন পাপ করেই বসে, তাহলে সাথে সাথে সে সুপথে ফিরে আসে, আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয় সীমাহীন। সুতরাং, রোযা হলো একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুচরিত্র গঠনের উপকরণ এবং তা সমৃদ্ধকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ এক মৌলিক উপাদান। আর বিদিত যে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাহার কোন মূল্য রাখে না; যদি না অভ্যন্তর সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই, রোযাদারের জীবনে তার আখলাক-চরিত্র স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, বর্ধনশীলতা ও শ্রীবৃদ্ধিশীলতার গুণাবলী গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তার সকল আচরণ ভিতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়।
৪। রোযা রোযাদারের আচার-ব্যবহারকে সুন্দর করার কাজে বড় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্ণ একটি মাস ধরে তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে নিরাপদে রাখে। বরং রোযা তাকে এক মহান ইবাদতে মশগুল রাখে, হীনতা ও নীচতা হতে রক্ষা করে, প্রত্যেক নোংরামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সুতরাং, সে না চুগলী করে, না গীবত; না মিথ্যা বলে, না অশ্লীল; না ফিতনা সৃষ্টি করে, না ফাসাদ; না অসার বকে, না ফালতু। কোনো প্রকারের পাপাচরণ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। ফলে, প্রকৃত রোযাদার রোযার পরেও একটি নিষ্পাপ ও পবিত্র মানুষের মত যাবতীয় সচ্চরিত্রতার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সুখময় জীবন-যাপন করতে পারে।
৫। রোযা মন ও প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলনের শিক্ষা দেয়; জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে, রোযাদার তার মন ও প্রবৃত্তিকে সেই কাজে ব্যবহার করতে পারে; যাতে ইহ-পারলৌকিক সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে। আর এমন আচরণ ও কর্ম থেকে তাকে দূরে রাখে; যাতে সে একটি ইন্দ্রিয়সেবী ও পাশবিক গুণসম্পন্ন মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে; যেখানে সে কামনা-বাসনা ও লালসার প্রবণতা থেকে তাকে রুখতে সক্ষম হয় না। সুতরাং, রোযা সেই মন্দপ্রবণ আত্মার বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিজয়ী হতে মুসলিমকে

সার্বিক সহযোগিতা করে, যে আত্মা সর্বদা হারাম কাজে লিপ্ত হতে চায়, অবৈধভাবে কাম-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। রোযা রোযাদারের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুপ্রবৃত্তির স্পর্শ থেকে দূরে থাকার প্রশিক্ষণ দেয়। রোযার মাঝে রয়েছে আত্মসংযম এবং কুপ্রবৃত্তির দমন। আধুনিক যুগের মানুষ অধিকাংশে নিজ কামনা-বাসনার কাছে বড় দুর্বল, কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ-প্রবণ খেয়ালখুশীর বশীভূত। আর মনকে সবল ও সুদৃঢ় করতে রোযা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। কারণ, রোযাদার অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থাকা সত্ত্বেও পানাহার বর্জন করে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এ কাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বকাজে মনোবল প্রবল ও সুদৃঢ় হয়।

৬। রোযা রোযাদারকে কুঅভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করে। এমন বহু মানুষ আছে, যারা এমন বহু নোংরা অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে পড়ে এবং তার ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু রোযা এলে তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা তাদের সে সমস্ত কুঅভ্যাসকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, এটাই হয় তাদের জন্য সুবর্ণ-সুযোগ; যার মাঝে তাদের সেই সকল মন্দ অভ্যাসের পঞ্জা থেকে নিজেদেরকে সহজ উপায়ে স্বাধীন করে নিতে পারে, যে সকল অভ্যাস তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও ব্যাধির একমাত্র কারণ। অতএব, সেই সকল রোযাদারগণ যারা ধুমপানে অভ্যাসী; যাদের অবৈধ বিড়ি-সিগারেট বিনা ৩০ মিনিটও অতিবাহত হয় না, অথবা তা পান না পর্যন্ত পায়খানাও হয় না, যাদের দৈনিক ১ প্যাকেট সিগারেট পানে তাদের ৫০ বছর জীবনে প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১৫২০৮ ঘ¦টা ২০ মিনিট সময় অপচয় হয়, তাদের উচিৎ, রোযার এই পবিত্র অবসরে এই শ্রেণীর 'বিষপান' চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করা। কারণ, এ 'সুখটান' এমন 'অগ্নিবাণ' যে, তা মানুষের সুসবাস্থ্য, দেহ, অর্থ, দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বড় ক্ষতিকর। যে মানুষ ১২/১৩ ঘন্টা আল্লাহর ওয়াস্তে তা বর্জন করে থাকতে পারে, সে মানুষ আল্লাহরই ভয়ে বাকী সময় পান না করলেও থাকতে পারবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো জিনিস বর্জন করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় তার চাইতে উত্তম জিনিস অর্জন করবে। এটাই হলো আল্লাহর রীতি। পরন্তু এ কোনক্রমেই উচিৎ নয় যে, রোযাদার সারাদিন হালাল জিনিস না খেয়ে রোযা রেখে পরিশেষে হারাম জিনিস দিয়ে রোযা খুলবে!

৭। রোযার মাঝে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখার সবিশেষ প্রশিক্ষণ। কারণ, রোযা হলো গুপ্ত ইবাদত। যেহেতু মানুষ এ ইবাদতে মুনাফেকী রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলে সে গোপনে খেতে বা পান করতে পারে, অথবা উপবাস থেকেও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সুতরাং, নিছক আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও সত্য ভয় না থাকলে প্রকৃতরূপে রোযা রাখা যায় না। বলা বাহুল্য, রোযা হলো এমন একটি আন্তরিক ইবাদত- যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে একান্ত গুপ্ত। অতএব গোপনে পানাহার করার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা

এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে বান্দা নিঃসন্দেহে এই বলে অটল বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তার গোপন সব কিছুই দেখেন ও জানেন। আর এখান থেকেই রোযাদারের মনে ইবাদতে সততা ও আমানতদারী সৃষ্টি হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা রোযাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন; বান্দার প্রত্যেক আমলের সওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ; বরং আরো অনেক অনেক গুণ বর্ধিত করে থাকেন। কিন্তু, রোযা নয়। রোযাকে তিনি নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। আর তার সওয়াবের পরিমাণ যে কত, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। মহানবী (স) বলেন, ‘‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তাতে তার সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোযা নয়। রোযা হল আমার জন্য। আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।’ ’

৮। রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। কারণ, সে আল্লাহর নিকট আখেরাতে যে সওয়াব ও প্রতিদান আছে তা পাওয়ার আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে পার্থিব কিছু সুখ-উপভোগ থেকে বিরত থাকে। সে যে নিক্তিতে লাভ-নোকসান ওজন করে থাকে তা হলো পারলৌকিক। রোযার দিনে পানাহার ও যৌনসুখ শুধু এই আশায় পরিহার করে যে, এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার সাথে সাথে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান পাবে। সুতরাং, এইভাবে রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি ঈমান বদ্ধমূল করে, পরলোকের সাথে অন্তরকে জুড়ে রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী এই ধরাধামের পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে; যে ভোগ-বিলাস অনেক সময় মানুষকে আখেরাতের কথা বিস্মৃত করে এই ধারণা দেয় যে, সে পৃথিবীতে অমর ও চিরকাল থাকবে।

৯। রোযা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করার কথা শিক্ষা দেয়। রোযা মুসলিমকে প্রকৃত দাসত্বের অনুশীলন দেয়। তাই তো সে রাতের বেলায় খায়, পান করে। কারণ, তার প্রভু যে বলেছেন-

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

বলা বাহুল্য, এ জন্যই ইফতার ও সেহরীর সময় খাওয়া হলো সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং না খেয়ে একটানা পরপর কয়েকদিন রোযা রাখা মকরূহ। অতএব রোযা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া এবং রোযার শেষে ইফতারী খাওয়া হলো এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশের আনুগত্য।

তদনুরূপ ফযর উদয় হলে মুসলিম পানাহার সহ সেই সকল বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকে, যাতে রোযা নষ্ট করে ফেলে। আর এর মাঝেও সে একমাত্র আল্লাহরই দাত্ব ও আনুগত্য করে। কারণ, তিনি বলেন-

অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

সুতরাং, এইভাবে মুসলিম মহান আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে।

১০। রোযা মুসলিমের জন্য আল্লাহর এক প্রকার রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শন করেই রোযা ফরয করেছেন। কারণ, এরই মাধ্যমে তিনি মুসলিমের পাপরাশি মার্জনা করে থাকেন, তার মর্যাদা উন্নীত করে থাকেন এবং বহুগুণ হারে তার সওয়াব বৃদ্ধি করে থাকেন।

১১। রোযা হল গোনাহের কাফ্ফারা। কারণ, নেকীর কাজ গোনাহর কাজের গোনাহ নাশ করে দেয়। আর রোযা হলো বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন- নিশ্চয় পুণ্যরাশি (সওয়াবের কাজ) পাপরাশিকে দূরীভূত করে। (কুরআনুল কারীম ১১/১১৪)

আর প্রিয় নবী (স) বলেন, “মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত পাপরাশিকে নামায, রোযা এবং সদকাহ মোচন করে দেয়।’ ’ অর্থাৎ, মুসলিম যে গোনাহ তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে উচ্চবাচ্য করে, কষ্ট দিয়ে অথবা কোনো বিষয়ে তাদের প্রতি ত্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা প্রতিবেশীকে কোন কথায় বা কাজে কোননো প্রকার কষ্ট দিয়ে, অথবা আর্থিক কোনো প্রকার ত্রুটি ঘটিয়ে অথবা অনুরূপ অন্যান্য সাগীরা (ছোট) গোনাহ করে থাকে, সে সবকে তার নামায, রোযা এবং দান-খয়রাত মোচন করে দেয়। প্রিয় নবী (স) বলেন- “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা রেখে রমাযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।’ ’

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, “কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ এবং এক রমাযান থেকে অন্য রমাযান -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।’ ’

তদনুরূপ রোযা হলো কসম ভাঙ্গার কাফফারা (জরিমানা)। (কুরআনুল কারীম ৫/৮৯) যিহারের কাফফারা। (কুরআনুল কারীম ৫৮/৪) কোনো মুসলিমকে বা চুক্তিবদ্ধ কোনো যিম্মীকে ভুলবশত: হত্যা করে ফেলার কাফফারা। (কুরআনুল কারীম ৪/৯২) ইহরামে নিষিদ্ধ কর্ম করে ফেলার কাফফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬, ৫/৫) তামাত্তু’ হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে তার কাফফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬) ইত্যাদি।

১২। রোযা রোযাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোযা তাকে তার প্রিয় বস্তু ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়।

বলা বাহুল্য, রোযা পালনে রয়েছে ৩ প্রকার ধৈর্য। মহান আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, তাঁর হারামকৃত বস্তু পরিহার করার উপর ধৈর্য এবং তাঁর নির্ধারিত তকদীরের বালা-মসীবতের উপর ধৈর্য। এই ৩ প্রকার ধৈর্য যে বান্দার মাঝে একত্রিত হবে, সেই হবে ইহকালে পরম সুখী এবং পরকালে আল্লাহর ইচ্ছায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন- অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার ও সওয়াব দান করা হবে। (কুরআনুল কারীম ৩৯/১০)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও যৌনক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করাই হল ধৈর্যের শেষ পর্যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করতে পারঙ্গম হবে, সে ব্যক্তির জন্য অন্য শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ব্যক্তি লাভ করবে শুভপরিণাম।

মহান আল্লাহ বলেন- যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য ধৈর্যকষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি যে রুযী তাদেরকে দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে- তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম; (আদ্ন) স্থায়ী বেহেশত, ওতে ওরা প্রবেশ করবে। (কুরআনুল কারীম ১৩/২২-২৩)

১৩। রোযা হলো ঢালস্বরূপ; দোযখ থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ। একটি মাত্র রোযা জাহান্নামকে রোযাদার থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান মাসের রোযা রাখে এবং প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা অথবা আরো অন্যান্য নফল রোযা রাখে, সে ব্যক্তি থেকে দোযখ কত বছরের পথ দূরে সরে যায় তা অনুমেয়।

১৪। রোযা হলো চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচার ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ঢালস্বরূপ। রোযা রোযাদারকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হিফাযতে রাখে, যেমন ঢাল মুজাহিদ (যোদ্ধা)কে শত্রুপক্ষের তীর ও তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী (স) বলেন- হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনক্ষুধা উপশমকারী। বলা বাহুল্য, যে যুবক বিবাহের খরচাদি বহন করতে সক্ষম নয়, সে যুবককে মহানবী এই নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তার কামক্ষুধা ও যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত করতে রোযার সাহায্য নেয়। কারণ, রোযা উক্ত ক্ষুধা ও উত্তেজনা দমন ও নিবারণ করে। আর অনেকের অভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত নববী চিকিৎসা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত যে, কামপীড়িত যুবকের জন্য যে কোনও সেব্য ঔষধ অপেক্ষা রোযাই হল উত্তম ও অব্যর্থ ঔষধ।

১৫। রোযা হলো বেহেশ্তেগামী পথ। আবূ উমামাহ (রা) জান্নাতে প্রবেশ করাবে এমন আমল প্রসঙ্গে যখন আল্লাহর নবী (স)-এর নিকট নির্দেশ চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন- তুমি রোযা রাখ। কারণ, তার মত অন্য কোন আমল নেই। তাছাড়া, মহানবী (স) রোযাদারকে বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক এক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। আর 'রাইয়ান' (তৃষ্ণাহীন) দ্বার আমল অনুযায়ী রোযাদারের জন্য বড় উপযুক্ত। কারণ, রোযা রাখার ফলে দুনিয়াতে সে পিপাসায় কাতর হয়। তাই তারই বিনিময়ে পরকালে- সেই দ্বারে যে প্রবেশ করবে সে (বেহেশতি পানীয়) পান করবে। আর যে ব্যক্তি একবার তা পান করবে, সে ব্যক্তি আর কোন কালেও পিপাসিত হবে না।

১৬। রোযা পালনের মাধ্যমে রোযাদার তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। যার জন্য তার উপবাস-জনিত মুখের দুর্গন্ধও আল্লাহর নিকট কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময় হয়! অথচ খালি পেটে থাকা অবস্থায় মুখ থেকে বের হওয়া ঐ দুর্গন্ধ কোন মানুষ পছন্দ করে না; বরং ঘৃণাই করে থাকে। কিন্তু তা মহান স্রষ্টার নিকটে অতি পছন্দনীয়। কারণ, এ গন্ধ তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে নির্গত হয়ে থাকে।

১৭। রোযাদার ব্যক্তির দুআ রোযা রাখা অবস্থায় কবুল হয়ে থাকে। প্রিয় নবী (স) বলেন- তিন প্রকার দুআ আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে; রোযাদারের দুআ, অত্যাচারিতের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।

১৮। রোযা কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনে রোযাদারের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে; বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি ওকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করে নাও।' অতঃপর মহান প্রভু তার সে সুপারিশ গ্রহণ করে নেবেন।

১৯। রোযা রোযাদারের জন্য ইহ-পরকালের খুশী ও সুখের হেতু। যেমন মহানবী (স) বলেন, "রোযাদারের জন্য রয়েছে ২টি খুশী; প্রথম খুশী হল ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয় খুশী হল প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।' '

রোযাদারের ইফতার করার সময় যে খুশী, তা হল সেই সুখ ও তৃপ্তির একটি নমুনামাত্র; যা মুমিন ব্যক্তি নিজ প্রভুর আনুগত্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে এটাই হলো আসল সুখ। এই সুখ ও তৃপ্তি দুইভাবে অনুভূত হয়ে থাকে-

(ক) আল্লাহ তাআলা ঐ ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য পানাহার বৈধ করে দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রকৃতি এই যে, (বিশেষ করে খিদে থাকা অবস্থায়) খাবার দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর এ জন্যই তা বর্জন করা হল আল্লাহর ইবাদত।

(খ) সে মুহূর্তে রোযাদার তার একটি রোযা সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী সে সেদিনকার রোযা ও ইবাদত যে পালন ও পূর্ণ করতে পারল, তারই খুশী তার মনকে আন্দোলিত করে তোলে।

পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় খুশী যা, তা রয়েছে পরকালে; যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে যাঁর জন্য রোযাদার রোযা রেখে থাকে।

২০। রোযা হল পরহেযগার ও নেক লোকদের ট্রেনিং-ময়দান; যার মাঝে আল্লাহর দেওয়া পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার উপর নিজেদের কর্তব্যের বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, রোযা দেহ-মনের জন্য একটি বড় রহমত। রোযার মাঝেই হৃদয় ও সকল চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত থাকে। সকল মনোবল তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর পথে জিহাদের কাজে বর্ধিত ও সংবদ্ধ হয়ে থাকে। যার পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, আল্লাহর বাণীই সমুন্নত হোক এবং কাফেরদের বাণী হোক অবনত; সে কাফের যেমনই হোক, তার যে নাম বা উপাধি হোক অথবা যে প্রতীকই হোক।

২১। রোযা হল কচি-কাঁচা শিশুর মনের মাটিতে 'আমানতদারী' র বীজ রোপণ করার এক বাস্তবভিত্তিক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রক্রিয়া। শিশু-কিশোরকে রোযা রাখতে অভ্যাসী করার সময় যখন তাকে পানাহার করতে নিষেধ করা হয় এবং খাবার ও পানি হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সে শুধু এই বিশ্বাসে তা খেতে পারে না যে, এ নিষেধ হল আল্লাহর এবং তিনি তাকে দেখছেন। অথচ এ ব্যাপারে কেবল তার মন ও বিবেক ছাড়া অন্য কেউ পর্যবেক্ষক নেই। সুতরাং কাঁচা মনে আমানতদারী বদ্ধমূল করতে এই অনুভূতি অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়াশীল আর অন্য কি হতে পারে? যার ফলে শৈশব থেকেই শিশু আমানতদারীর মত এক নৈতিকতাপূর্ণ কর্মে অভ্যাসী হয়ে গড়ে ওঠে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তার যথার্থ হিফাযত করতে ও তার মনে তা আজীবন বহাল রাখতে কোন প্রকার কষ্টবোধ করে না।

২২। রোযা মানুষের হৃদয়কে নরম করে, আল্লাহ-প্রেমী করে এবং সর্বদা তাঁর যিক্র ও শুক্র করতে অভ্যাসী করে।

২৩। রোযা মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ ও প্রবাহ-পথ রুদ্ধ করে। এর ফলে তার দেহ-মনে শয়তানের আধিপত্য কমে যায়। পক্ষান্তরে যখনই মানুষ নিজ প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, তখনই শয়তান তা লুফে নিয়ে তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালিত করতে থাকে।

২৪। রোযা হলো আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, রোযা হলো পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার নাম। আর মানুষের উপর আল্লাহর যে সকল বড় বড় নেয়ামত রয়েছে তার মধ্যে পানাহার ও যৌনমিলন হল অন্যতম। সুতরাং মানুষ এ নেয়ামতের কদর তখনই বুঝবে, যখন সে এ নেয়ামত থেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে। কারণ, হারিয়ে না গেলে কোন নেয়ামতের কদর বুঝা যায় না। আর যখনই

উক্ত নেয়ামতের কদর সে বুঝবে, তখনই তার অবশিষ্ট অধিকার আদায়ের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে। পক্ষান্তরে নেয়ামতের শুক্র আদায় করা ফরয; শরীয়তে এবং বিবেক মতেও। রোযার আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেন- যাতে তোমরা শুক্র আদায় কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন সে সেই গরীব-নিঃসবদের কষ্টের কথাও উপলব্ধি করে; যারা ক্ষুধার সময় পেটে এক মুঠো অন্নও যোগাড় করতে সমর্থ নয়। এর ফলে ঐ উপলব্ধি তাকে তাদের জন্য দান-খয়রাত করে সহানুভূতি প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, নিজের দেখা বিষয় শোনা বিষয়ের মত নয়। নিজের দেখা ও পরীক্ষা করা বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতীতি জন্মে অধিক। যেমন একজন ঘোড়সওয়ার লোক পথ চলার কষ্ট ততক্ষণ অনুভব করতে সক্ষম নয়; যতক্ষণ না সে নিজে পায়ে হেঁটে পথ চলে দেখেছে।

২৫। রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষুধা-জনিত দুর্বলতার ফলে সে আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী তা আন্দাজ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিজের মাঝে নিজের দুর্বলতা চিনতে পারে, সে ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার দূরীভূত হয়ে যায়। পরন্তু আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে নিজের কদর নিজে জেনেছে।

২৬। রোযাতে রোযাদার ফিরিশ্তামন্ডলীর অনুরূপ কর্মে শামিল হতে পারে; যে ফেরেশতা-মন্ডলী আল্লাহর কোন প্রকার অবাধ্যাচরণ করেন না। তাঁরা তাই করেন, যা করতে তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে আদেশ করেন। দিবারাত্র তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ করেন না। যাঁরা খান না এবং পানও করেন না।

২৭। রোযা রোযাদারের ঈমান বৃদ্ধি করে। এই রোযাতে মানুষ অধিকাধিক নামায পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর করে, দান-খয়রাত করে, দুআ ও ইস্তিগফার তথা তওবা করে, ওয়ায-নসীহত শোনে। রোযা তাকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, এ সবে পাপ বন্ধ থাকে এবং ঈমান বর্ধিত হয়।

২৮। রোযার মাসে রোযাদারের দ্বীনী জ্ঞান বর্ধিত হয়ে থাকে। কারণ, রমাযান হলো ইবাদতের মাস, আল্লাহর আয়াত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও গবেষণা করার মাস। কুরআন মাজীদ তেলাঅত করা ও শোনার মাস।

২৯। এ মাসে দ্বীনের আহবায়কদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এ মাসে অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে কেউ বা তার জীবনে প্রথমবার প্রবেশ করে, কেউ বা অনেক দিন হল মসজিদ ত্যাগ করেছিল। এ সময় তাদের হৃদয় এক প্রকার দুর্লভ নম্রতা ও তরঙ্গায়িত ভক্তিতে গদগদ করে। সুতরাং, এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মন-গলানো উপদেশমালা এবং উপযুক্ত ওয়াজ ও দারস প্রয়োগ করে তাদের ঈমান বাড়াতে সাহায্য করা উচিত। আর এ কাজে অবশ্যই সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে সহায়তা হয়ে থাকে।

পরন্তু, রমাযানের রোযা বছরান্তে একবার ফরযরূপে এসে থাকে। যা হজ্জের মত জীবনে একবার নয়। যাতে প্রত্যেক বছর ঈমানী দর্সের পুনরাবৃত্তি হয় এবং রোপিত ঈমানী বৃক্ষ সহসায় বেড়ে ওঠে।

৩০। রোযার মাধ্যমে মুসলিমদের সামাজিক উপকারিতা সাধন হয়ে থাকে। রোযা হলো মুসলিম জাতির ঐক্যের নিদর্শন, সারা উম্মাহর মাঝে সংহতির প্রতীক, গরীব-ধনীর মাঝে সাম্য ও সম্প্রীতির চিহ্ন। এতে আম-খাস, আতরাফ-আশরাফ, আমীর-ফকীরের ভেদাভেদ চূর্ণ হয়ে যায়। সকলের মনে একটাই বোধ জাগে যে, মুসলিম জাতি হল এক জাতি। সকলে একই সময়ে পানাহার করে, একই সময়ে রোযা রাখে। একই জামাআতে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ে। যেন সকলের হৃদয় এক, মাস এক, কর্মও এক, যাদেরকে তাদের নবী (স) বলেছেন, তারা হলো একটি দেহের মত।

৩১। রোযার উপবাস স্বাস্থ্যের জন্য বড় উপকারী। রোযাতে তুলনামূলকভাবে কম খাওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে পাকস্থলীকে বিরতি দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরের মেদ, ক্লেদ ও আর্দ্রতা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়। আর একথা বিদিত ও স্বীকৃত যে, শরীরের মধ্যে পেট হল রোগের বাসা এবং ব্যবস্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আহার করা হল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। বলা বাহুল্য, এ কথা বহু চিকিৎসকই স্বীকার করেছেন যে, রোযাতে রয়েছে বহু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা, বিশেষ করে যক্ষ্মা, ক্যানসার ইত্যাদি। রোযায় রয়েছে শরীরের ওজন বৃদ্ধি, হ্যাপাটাইটিস, জন্ডিস, প্লীহা, যকৃৎ, বদহজম, প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

রোযা ফরয হয়েছে সুস্থ মানুষের উপর। যাতে আক্রমণের পূর্বেই ঐ সকল বা আরো অজানা বহু রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় পাওয়া যায়। তাছাড়া বহু গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার; যা মহান সৃষ্টিকর্তা নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী জীবজগতের জন্য অনিবার্য করেছেন। আর তা শুধু এই জন্য যে, যাতে করে প্রাণীজগৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, বাঁচার জন্য শক্তি পায় এবং নিজ নিজ বংশবিস্তারে যথানিয়মে সক্রিয় থাকতে পারে।

জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের উপবাস করার কথা অনেকের অজানা নয়। কোন কোন জন্তু লম্বা সময় ধরে প্রায় কয়েক মাস যাবৎ উপবাস করে। কোন কোন জন্তু কয়েক দিন ধরে উপবাস করে। বরং উদ্ভিদজগৎও উপবাস পালন করে থাকে। যার ফলে নতুন, সুন্দর ও লকলকে পাতা বের হয়ে আসে এবং শান্ত শীতে নিদ্রার পর ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে শক্তিশালী ও সজীবরূপে শুরু হয় বৃক্ষ-তরুলতার আনন্দময় বসন্তকাল।

ড. সলোমন মানব-দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষাকল্পে মধ্যে মধ্যে ডকে নিয়া চুল্লি হইতে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যেমনটা আবশ্যক- উপবাস দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী হইতে অজীর্ণ খাদ্যটি নিষ্কাশিত করাও তেমনটা দরকার।'

৩২। রোযা মানুষের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি করে। কারণ, পেট খালি থাকলে চিন্তা-গবেষণা নির্মল হয় এবং মন-মগজের কর্ম সুন্দর হয়। পক্ষান্তরে, যারা ধারণা করে যে, রোযা মানুষের খরচ বাড়ায় এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় এই রোযার মাসে, তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা, খাবারের নানান ভ্যারাইটিজ তৈরী করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খাবার প্রস্তুত করা, রমাযানের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরন ও বরনের খাদ্যপণ্যের বিপণন ঘটানোতে ইসলামের অনুমোদন নেই। বরং তা হলো অপচয়। আর অপচয় ইসলামে নিষিদ্ধ; রমাযানে এবং অন্য মাসেও। বলাই বাহুল্য যে, রোযাতে রয়েছে মঙ্গল। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সেই মঙ্গল অনস্বীকার্য। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে সেই মঙ্গলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন- তোমাদের রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদীস শরীফের বিস্তৃত বর্ণনায় রমযান মাসের বৈশিষ্ট্য ও নির্দেশনা রয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

১) সিয়াম ও কিয়ামের মাস

মুসলিম উম্মাহর নিকট রমযান মাসের আগমন ঘটে প্রধানত রোযা ও তারাবীহর বার্তা নিয়ে। এটি রমযান মাসের বিশেষ আমল। তাই, প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য- পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এ দুই বিষয়ে যত্নবান হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি; যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বনকারী (মুত্তাকী) হতে পার। [সূরা বাকারা (২) ১৮৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন-

لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ.

যখন রমযান মাসের আগমন ঘটল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন- তোমাদের নিকট বরকতময় মাস রমযান এসেছে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এ মাসের রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদেরকে শিকলে বন্দী করা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো; সে তো প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৭১৪৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৪১৬; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৮৩৮৩; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৮৯৫৯]

২) আল-কুরআন নাযিলের মাস

রমাযানুল মুবারকের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো- তা আল-কুরআন নাযিলের মাস। এই পবিত্র মাসেই আল্লাহ তাআলা পূর্ণ কুরআন মাজীদ লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। অতপর রাসূলে কারীম (স) এর নিকট কুরআনের সর্বপ্রথম ওহী এ মাসেই নাযিল হয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

রমযান মাস- যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সুপথ প্রাপ্তির সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক্ব-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। সুতরাং, তোমাদের যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে। [সূরা বাকারা (২): ১৮৫]

৩) মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম মাস

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ، وَمَا يُعِد فِيهِ الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلَاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ، هُوَ غنْم الْمُؤْمِن يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ.

আল্লাহ তাআলার কসম! মুসলমানদের জন্য রমযানের চেয়ে উত্তম কোনো মাস আসেনি এবং মুনাফিকদের জন্য রমযান মাসের চেয়ে অধিক ক্ষতির মাসও আর আসেনি। কেননা মুমিনগণ এ মাসে (গোটা বছরের জন্য) ইবাদতের শক্তি ও পাথেয় সংগ্রহ করে। আর মুনাফিকরা তাতে মানুষের উদাসীনতা ও দোষক্রুটি অন্বেষণ করে। এ মাস মুমিনের জন্য গনীমত আর মুনাফিকের জন্য ক্ষতির কারণ। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৩৬৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৮৯৬৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৮৮৪; তবারানী হাদীস ৯০০৪; বাইহাকী শুআবুল ঈমান, হাদীস ৩৩৩৫]

৪) রহমতের মাস

রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَيَاطِينُ.

যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৭৯; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৬৮৪; সুনানে দারেমী, হাদীস ১৭৭৫]

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلّ لَيْلَةٍ.

যখন রমযান মাসের প্রথম রাতের আগমন ঘটে, তখন দুষ্ট জ্বিন ও শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে- হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণের প্রার্থী! থেমে যাও। আর আল্লাহ তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দান করেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৮২; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস ৩৬০১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪২; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৫৭২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৮৯৬০]

৫) জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস এবং দুআ কবুলের মাস

আল্লাহ তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দান করেন। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য, বেশি বেশি নেক আমল এবং তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজেদেরকে এই শাহী ফরমানের অন্তর্ভুক্ত করা।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে; আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন-

إِن لِلهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. وقال البوصيري : رجال إسناده ثقات

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমযান মাসে প্রতি ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। প্রতি রাতেই তা হয়ে থাকে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৩, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২২০২, আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৮০৮৮; সুনানে বায়হাকী, হাদীস ৩৬০৫]

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

إِنّ لِلهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،(يعني في رمضان). لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের প্রত্যেক দিবস ও রাত্রিতে অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দার একটি করে দুআ কবুল করেন। [মুসনাদে আহমাদ হাদীস ৭৪৫০, মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৯৬২]

৬) দানশীলতার মাস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَجْوَدَ النّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرّيحِ المُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তাঁর দানশীলতা (অন্য সময় হতে) অধিকতর বৃদ্ধি পেত রমযান মাসে, যখন জিব্রীল (আ) তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জিব্রীল (আ) রমযানের প্রতি রাতে আগমন করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন শুনাতেন। আল্লাহর রাসূল (স) তখন কল্যাণবাহী বায়ু চেয়েও অধিক দানশীল। [সহীহ বুখারী, হাদীস ৬, সহীহ মুসলিম হাদীস ২৩০৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬১৬]

৭) আমলের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধির মাস

রমযান মাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এ মাস মুমিনের নেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধির মাস এবং আখেরাতের সওদা করার শ্রেষ্ঠ সময়। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ...إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِن عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

وفي رواية أخرى لمسلم : فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক আনসারী মহিলাকে বললেন, বর্ণনাকারী বলেন, তার নাম ইবনে আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি (অন্য বর্ণনায় তার নাম উম্মে সিনান উল্লেখ করা হয়েছে) তুমি কেন আমাদের সাথে হজ্ব করতে যাওনি? তিনি বললেন, আমাদের পানি বহনকারী দুটি মাত্র উট রয়েছে। একটিতে আমার ছেলের বাবা (স্বামী) ও তাঁর ছেলে হজ্ব করতে গিয়েছেন, অন্যটি পানি বহনের জন্য আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেন, রমযান মাস এলে তুমি উমরাহ করবে। কেননা এ মাসের উমরাহ একটি হজ্বের সমতুল্য। সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনা আছে; রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন- রমযান মাসের উমরাহ একটি হজ্বের সমতুল্য। অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্বের সমতুল্য (সওয়াবের হিসাবে)। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৭৮২, সহীহ মুসলিম ১২৫৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২০২৫]

৮) পাপ মোচন ও গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের মাস

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন-

الصلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُن إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ.

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মুছে দেয় যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩ (৩)]

ক্ষমা লাভের এমন সূবর্ণ সুযোগ পেয়ে যে ব্যক্তি নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করাতে পারে না সে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত। হাদীস শরীফে তার জন্য বদ দুআ করা হয়েছে।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বললেন, তোমরা মিম্বরের নিকট সমবেত হও। আমরা সকলেই সেখানে উপস্থিত হলাম। যখন তিনি মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন, তখন বললেন, আমীন, যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন বললেন, আমীন, যখন তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন বললেন- আমীন। হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা) বলেন, যখন তিনি (মিম্বর থেকে) অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা (মিম্বরে উঠার সময়) আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। উত্তরে তিনি বললেন, জিব্রীল (আ) আমার নিকট আগমন করেছিলেন, যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলাম, তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমযান মাস পেল, তবুও তার গুনাহ মাফ হলো না। আমি বললাম, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম তখন বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হল অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পড়ল না। আমি বললাম আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম, তখন বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে পেলো অথচ তারা উভয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। অর্থাৎ, তাদের খেদমতের মাধ্যমে নিজেকে জান্নাতবাসী করতে পারল না। আমি বললাম, আমীন। [মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৩৩৮; মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ১৭৩১৭]

৯) লাইলাতুল কদরের মাস

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ হতে মুসলিম উম্মাহর জন্য আরেকটি বিশেষ দান হলো- এক হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

'লাইলাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিব্রীল আ) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক কল্যাণময় বস্তু নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যে রাত পুরোটাই শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।' [সূরা কদর (৯৭): ৩-৫]

এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন-

دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِن هَذَا الشَهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّه، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ.

قال المنذري : إسناده حسن، إن شاء الله، وكذا قاله البوصيري.

রমযান মাসের আগমন ঘটলে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের নিকট এই মাস সমাগত হয়েছে, তাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে প্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। একমাত্র (সর্বহারা) দুর্ভাগাই এ রাতের কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৪]

রোযায় করণীয়

১) প্রাপ্তবয়স্ক, সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন, রোজা পালনে সুস্থ নারী ও পুরুষের জন্য রমজান মাসে রোযা রাখা ফরজ। ঋতুবর্তী নারী, সন্তান প্রসবকারী মা, অসুস্থ ব্যক্তিরা এই রোজা পরবর্তী সময়ে কাজা আদায় করবে। এমন অক্ষম ব্যক্তি, যাঁদের আবার সুস্থ হয়ে রোযা পালনের সামর্থ্য লাভের সম্ভাবনা নেই, তাঁরা প্রতিটি রোযার জন্য একটি সদকাতুল ফিতরের সমান ফিদিয়া প্রদান করবে। যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের এই ফিদিয়া প্রদান করা যায়।

২) তারাবিহ এ মাসের অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত এবং প্রতিশ্রুত সওয়াব ও পুরস্কার লাভের বিশেষ আমল। তাই তারাবিহর নামাজ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা উত্তম।

৩) দান-সদকা সর্বাবস্থাতেই উৎকৃষ্ট আমল; কিন্তু, রোযায় এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। হাদিসে এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ (সা) দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। রোযার মাসে তাঁর দানের হাত আরও প্রসারিত হতো।' [সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯০২]

৪) রোযার মাসে অধিক পরিমাণে আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে । কারণ, মহানবী (সা) জিবরাইল (আ)-এর সঙ্গে রমযানের প্রতি রাতে কুরআন মাজিদ পুনরাবৃত্তি করতেন। হাদিসে এসেছে- 'হজরত জিবরাইল (আ) রমযানের শেষ পর্যন্ত প্রতি রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করে শোনাতেন।' [সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯০২]

৫) অধিক পরিমাণে জিকির-আজকারের সঙ্গে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নৈকট্য অর্জনের উপযুক্ত মৌসুম।

৬) যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও নিজের গুনাহগুলো ক্ষমা করাতে পারল না, তার ওপর জিবরাইল (আ) ও মহানবী (সা) অভিসম্পাত করেছেন। তাই, জীবনের কৃত গুনাহের কথা স্মরণ করে বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার করা এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়ার এটিই উত্তম সময়।

৭) রমযানের মাসের শেষ দশকের সুন্নত ইতিকাফ অত্যন্ত ফযিলতের আমল। হাদিস শরীফে এসেছে- 'রাসূল (সা) রমজানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ পালন করতেন।' [সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৭১]

৮) ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতম রজনী শবে কদর তালাশ করা মুমিনের অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন- 'নিঃসন্দেহে কদরের রাতে আমি আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আর আপনি কি জানেন শবে কদর কী? শবে কদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ রাতে ফেরেশতা ও রুহুল কুদস (জিবরাইল আ) পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করেন। (এ রাতের) আগাগোড়া শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।' [সুরা কদর, আয়াত: ১-৫)]

রোযার গুরুত্ব

রোযা ফরজ ইবাদত। এটি দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে ফরজ হয়। রমযান মাসের প্রধান আমল- রোযা। এই রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। এ সম্পর্কে আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিধি-বিধান নিম্নরূপ:

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো। [সূরা বাকারা (২): ১৮৩]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। [সূরা বাকারা (২): ১৮৫]

রাসূলের প্রিয় সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৮০ (১৭-১৮)]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

এছাড়া, কোনো শরয়ী ওযর ব্যতীত কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে, তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি- আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এলো। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের ওপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি ওপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম; আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চললো। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে। [সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস: ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস- ১৬০৯; তবারানী, হাদীস: ৭৬৬৬]

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না; ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস: ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০]

হযরত আলী (রা) বলেন-

من افطر يوما من رضمان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে; সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৯৮৭৮]

রোযার ফযিলত

পবিত্র কুরআন মাজিদ এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযিলত ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে উপস্থাপন করা হলো:

১) রোযার প্রতিদান আল্লাহ সুবহানু তায়ালা নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে; যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযা হলো- আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়; একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৬৩৮]

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০]

অন্য বর্ণনায় রোযা বিষয়ে আল্লাহ সুবহানু তায়ালা বলেন- “প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য; পক্ষান্তরে, রোযা আমার জন্য; আর, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। [সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪]

কথাটির তাৎপর্য হলো- যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে; তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ

পার্থক্য রয়েছে; তা হলো- অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লৌকিকতা সৃষ্টি হতে পারে; তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে, সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে, রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত- যার আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারও নিকট প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই, রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণে, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। রোযার এত বড় ফযিলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্য ধারণকারীদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সুসংবাদ হলো-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। [সূরা যুমার (৩৯): ১০]

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না; অর্থাৎ, বিনা হিসাবেই দিবেন।

২) আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা রোযাদারকে কিয়ামতের দিন স্বয়ং পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত-

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش، رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (5095)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب (1478)، : إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ তায়ালা নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন- যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। [মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস: ৫০৯৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন- রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারও আগমন ঘটবে না। [মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস: ৫০৯৩]

৩) রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর নবী (স)-কে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম; তারপর তিনি বললেন- যে ব্যক্তি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ২৮৫৪]

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে আগমন করে বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ২৫৩০]

৪) রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, নবী (স) ইরশাদ করেছেন- জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান; কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে; তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অত:পর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে, কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২৮১৮]

হযরত সাহল ইবেন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন- জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান; রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস: ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ২৫৪৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন- প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস: ৩২৬২৮]

এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

[সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস-৩০৯]

৫) রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.
وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন- রোযা হলো ঢাল; বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস: ৩৫৭০]

উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি-

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হলো জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল; যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৬৩৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (স) ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হলো (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১]

৬) রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তিলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস: ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস: ১৯৯৪]

৭) রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০ (১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৮৯৬৮]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তোমাদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে

সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে; যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্য-ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮]

৮) রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া আল-কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন- ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই, সহজেই বোধগম্য যে- রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হলো- নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ২২৫৮]

৯) রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস:১৬৩৮]

১০) রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে- যখন সে আনন্দিত হবে; ক) যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। খ) যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন

তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি রোযাদারকে পুরস্কৃত করবেন, তখন রোযাদার আনন্দিত হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৭৬৬]

১১) পরকালে রোযাদার সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী (রা) হতে বর্ণিত-

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? রাসূল (স) বললেন- তুমি সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে। [মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৩৪২৯]

১২) রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না; অর্থাৎ, তার দুআ কবুল হয়। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৭৫৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذى : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না; অর্থাৎ, তাদের দুআ কবুল করা হয়- ক) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ; খ) ইফতারের সময় রোযাদার ব্যক্তির দুআ; এবং গ) মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার ওপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ঘোষণা করেন- আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ৮০৪৩; সুনানে

তিরমিযী, হাদীস: ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৩৪২৮]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) র্বণনা করেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন-

الصائم لا ترد دعوته،

وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৮৯৯৫]

১৩) রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،

وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (اى ابن عباس)

হযরত ইবনে আববাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। [মুসনাদে বাযযার, হাদীস: ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৬৫২৩]

১৪) রোযা আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখো, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখো, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই। [সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস: ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস: ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস: ২৫৩৩]

عن أبى أمامة الباهلى قال : قلت يا رسول الله مرنى بأمر ينفعنى الله به، قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له.

هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখো, কেননা তার তুলনা হয় না। [সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস: ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস: ৭৪৬৩]

১৫) রমযান গোনাহ মাফ করানোর মাস

রমযান মাসে গোনাহ মাফের জন্য বেশি-বেশি করে দোয়া ও ইবাদত করতে হবে। রাসুল (স) বলেন- যে ব্যক্তি রমযান মাস পাইল, অথচ গোনাহ মাফ করাতে পারল না; তার মতো হতভাগা আর নেই।

১৬) রোযা ও ইবাদত বান্দাকে অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা করে

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, রমযান মাসে রোযা রাখা, প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা, মাসে নির্দিষ্ট ৩ দিন রোযা রাখা, মহররম মাসে বেশি বেশি রোযা রাখা, মহররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখলে বান্দা অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। রমযানের ১ মাস ও শাওয়ালের ৬ দিন রোযা রাখলে সারাবছর রোযা রাখার সওয়াব হয়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোযা

রোযা পালন করতে গিয়ে একজন মুসলিমের রমযান মাসের প্রতিদিন সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হয়। এছাড়া, মুসলিমরা এসময় সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা কথা, অশ্লীল যৌন প্রবৃত্তির মতো কর্ম করা থেকে বিরত থেকে নিজেদের শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। এ কারণে রোজা যে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে তা নয়, বরং শারীরিক ও মানসিক উন্নতিও ঘটায়।

শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও রোযার উপকারিতা অপরিসীম। জীববিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আমরা জানি- প্রতিটি প্রাণীর শরীর একটি উচ্চতর এবং সূক্ষ্ম জৈব রাসায়নিক কারখানা এবং এটিকে সচল রাখতে প্রয়োজন হয় শক্তি। উক্ত শক্তির যোগান দিতে স্রষ্টা জীব জগতের জন্য নানা প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন। সাধারণত একজন মানুষের এই শক্তি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে কমপক্ষে দৈনিক তিনবার খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। তবে উন্নত আত্মা সম্পন্ন জীব হওয়ায় মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য হলো মানুষ তার ক্ষুধা-পিপাসা এবং যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং, রমযান মাস প্রকৃতপক্ষে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়।

রোযা নিয়ে বিস্ময়কর তথ্য দিয়ে নোবেল পেয়েছেন জাপানি গবেষক ও বিজ্ঞানী ওশিনরি ওসুমি। তিনি ‘অটোফেজি’ নিয়ে গবেষণা করে ২০১৬ সালে নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন। তিনি প্রতিবছর রোযা রাখেন। তবে, তিনি কেনো রোযা রাখেন- এ সর্ম্পকে এক সাক্ষাতকারে মুসলমানদের পবিত্র রোযা সম্পর্কে এক বিস্ময়কর তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুসলমানরা যাকে রোযা বলে, আমি তাকে বলি ‘অটোফেজি’। রোযার মাসে খাবার-দাবারের ঝামেলা, তাই এই মাসটা আমি অটোফেজি করি।

অটোফেজি সম্পর্কে তিনি বলেন- অটোফেজি শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ। এর মানে নিজে নিজেকে খাওয়া। চিকিৎসা বিদ্যায় নিজের গোস্ত নিজেকে খেতে বলে না। শরীরের কোষগুলো বাহির থেকে কোনো খাবার না পেয়ে নিজেই যখন নিজের অসুস্থ কোষগুলো খেতে শুরু করে, তখন চিকিৎসা বিদ্যার ভাষায় তাকে বলা হয়- অটোফেজি।

আমাদের ঘরে যেমন আবর্জনার স্থান বা ডাস্টবিন থাকে কিংবা আমাদের কম্পিউটারে যেমন রিসাইকেল বিন থাকে, তেমনি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের মাঝেও একটি করে ডাস্টবিন আছে। সারা বছর শরীরের কোষগুলো খুব ব্যস্ত থাকার কারণে, ডাস্টবিন পরিষ্কার করার সময় পায় না। ফলে কোষগুলোতে অনেক আবর্জনা ও ময়লা জমে যায়। শরীরের কোষগুলো যদি নিয়মিত তাদের ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে না পারে, তাহলে কোষগুলো একসময় নিষ্ক্রিয় হয়ে শরীরে বিভিন্ন প্রকারের রোগের উৎপন্ন করে। ক্যান্সার বা ডায়াবেটিসের মত অনেক বড় বড় রোগের শুরু হয় মূলত এখান থেকেই।

মানুষ যখন খালি পেটে থাকে, তখন শরীরের কোষগুলো অনেকটা বেকার হয়ে পড়ে। কিন্তু, তারা তো আর আমাদের মত অলস হয়ে বসে থাকে না, তাই প্রতিটি কোষ তার ভিতরের আবর্জনা ও ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করে। কোষগুলোর আমাদের মত আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই বলে তারা নিজের আবর্জনা নিজেই খেয়ে ফেলে। চিকিৎসা বিদ্যার ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয়- অটোফেজি।

মানব শরীরে যে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত তা হলো- আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, মিনারেল ও পানি। মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্মে যে শক্তি ব্যয় হয়, তা আসে খাদ্য থেকে। সাধারণত খাদ্য গ্রহণ এবং শক্তি ব্যয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে তা অতিরিক্ত মেদ হিসেবে জমা হয় এবং প্রয়োজনের চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরের স্বাভাবিক গঠন ভেঙে যেতে থাকে। যেহেতু মুসলিমদের দীর্ঘ একটি মাস রোযা রাখতে হয়, স্বাভাবিকভাবেই এতে ওজন কিছুটা হ্রাস পায়। তবে, সাহরী ও ইফতার নামক সুন্দর ব্যবস্থার কারণে এই ওজন কমে যাওয়ার হার আশঙ্কাজনক পর্যায়ে হয় না। রোযার সময় মানবদেহে শরীরবৃত্তীয় বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়।

রোযা অবস্থায় কমপক্ষে ১৫ ঘণ্টা যাবতীয় খানাপিনা বন্ধ থাকে। এ সময় পাকস্থলী, অন্ত্র-নালী, যকৃত, হৃদপিণ্ডসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্রাম পায়। তখন এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজেদের পুনর্গঠনে নিয়োজিত হতে পারে। অন্যদিকে দেহে যেসব চর্বি জমে শরীরের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো রোযার সময় দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য ছুটে যায়। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানী ড. শেলটন তার 'সুপিরিয়র নিউট্রিশন' গ্রন্থে বলেছেন- উপবাসকালে শরীরের

মধ্যকার প্রোটিন, চর্বি, শর্করা জাতীয় পদার্থগুলো স্বয়ং পাচিত হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোষগুলোর পুষ্টি বিধান হয়।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মেডিসিন ও সার্জারি চিকিৎসার প্রখ্যাত ড. অ্যালেকসিস বলেছেন- উপবাসের মাধ্যমে লিভার রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়, ফলে ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি, পেশীর প্রোটিন, গ্রন্থিসমূহ এবং লিভারে কোষসমূহ আন্দোলিত হয়। আভ্যন্তরীণ দেহ যন্ত্রগুলোর সংরক্ষণ এবং হৃদপিণ্ডের নিরাপত্তার জন্য অন্য দেহাংশগুলোর বিক্রিয়া বন্ধ রাখে। খাদ্যাভাব কিংবা আরাম-আয়েশের জন্য মানুষের শরীরের যে ক্ষতি হয়, রোযা তা পূরণ করে দেয়।

এ বিষয়ে ড. আইজাক জেনিংস বলেছেন- 'যারা আলস্য ও গোড়ামীর কারণে এবং অতিভোজনের কারণে নিজেদের সংরক্ষিত জীবনী শক্তিকে ভারাক্রান্ত করে ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়, রোজা তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী নাষ্টবারনার বলেন, 'ফুসফুসের কাশি, কঠিন কাশি, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা কয়েকদিনের রোযার ফলে নিরাময় হয়।'

রোযা সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী ড. আব্রাহাম জে হেনরি বলেছেন- রোযা হলো পরমহিতৈষী ওষুধ বিশেষ। কারণ, রোযা পালনের ফলে বাতরোগ, বহুমূত্র, অজীর্ণ, হৃদরোগ ও রক্তচাপজনিত ব্যাধিতে মানুষ কম আক্রান্ত হয়। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, রোযাদার পেপটিক আলসারের রোগীরা রোযা রাখলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও হাঁপানি রোগীদের জন্যও রোযা উপকারী।

চিকিৎসকদের মতে, রোযার ফলে মস্তিষ্কের সেরিবেলাম ও লিমরিক সিস্টেমের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ার কারণে মনের অশান্তি ও দুশ্চিন্তা দূর হয়; যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য মঙ্গলজনক। বহুমূত্র রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোযা খুব উপকারী। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেছে- একাধারে ১৫ দিন রোযা রাখলে বহুমূত্র রোগের অত্যন্ত উপকার হয়।

জি ফ্রস্ট ও এস পিরানি ১৯৮৭ সালে ১৫ জন সৌদি যুকবের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন, রমজান মাসে যদিও তাদের খাবার গ্রহণের বারের সংখ্যা কমে গেছে; অন্যদিকে শর্করা, প্রোটিন ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এ সময় যেহেতু পানি পান থেকেও বিরত থাকতে হয়, সেহেতু দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে ঘাম, মল ও মূত্রের মাধ্যমে

পানির পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থায় বিভিন্ন হরমোনের মাধ্যমে কিডনি রক্তে পানি ধরে রাখার চেষ্টা করে।

ক্যালোরি রেস্ট্রিকশনের ওপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন- দিনের গৃহীত ক্যালোরির পরিমাণ কমিয়ে আনলে তা শারীরিক স্থায়িত্ব বাড়ায় এবং বেশকিছু জটিল অসুখের ফলে সৃষ্ট জটিলতা কমিয়ে আনে; যেমন- রক্তনালীতে চর্বি জমে সৃষ্ট অ্যাথেরোসেক্লারোসিস, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি রোগ ও নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ।

২০১২ সালে ট্রাবেলসি এবং তার সহযোগীরা দুই ধরনের রোযাদারদের ওপর গবেষণা চালান। যাদের একদল ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে এরোবিক এক্সারসাইজ; যেমন- সাইকেল চালানো ও সাঁতার কাটা অনুশীলন করেছেন এবং আরেক দল ইফতারের পর একই অনুশীলনগুলো করেছেন। তারা দেখেন- রোযাশেষে প্রথমোক্ত দলের শরীরের চর্বি কমলেও পরবর্তী দলে তা অপরিবর্তিত রয়েছে।

সুতরাং, বর্ণিত গবেষণাগুলো থেকে ধারণা করা হয়- রমজান মাসে ইফতার ও সাহরীর সময় খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা গেলে ওজন কমবে। গবেষণায় দেখা গেছে- রমজান মাসে মুসলিমদের খাবারের সময়ের সাথে সাথে খাবারের ধরনেও বেশ পরিবর্তন আসে। আমাদের দেশে রমজান মাস এলে ইফতারের সময় আলুর চপ, পেঁয়াজু, বেগুনি জাতীয় ভাজাপোড়া খাবারের সাথে হালিম, ছোলা, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া হয়। এছাড়া, খেজুরসহ বিভিন্ন ফল ও ফলের রস, চিঁড়া, দধি, কলা প্রভৃতি খাবার গ্রহণ করা হয়। বিরিয়ানি, তেহারি, পোলাও জাতীয় খাবার গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যায়। এগুলো পরিমান মতো খাওয়া ব্যালেন্স ডায়েটিং এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের বা ধর্ম মানে না- এমন অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ সারা বছরে বিভিন্ন সময়ে 'অটোফেজি' করে শরীরটাকে সুস্থ রাখে। অটোফেজিতে ক্যান্সারের কোষও মারা যায়! অটোফেজি আবিষ্কার হলো ২০১৬ সালে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা এর উপকারীতা জেনে এখন অটোফেজি করছে। আর, মুসলিমরা অটোফেজি করে আসছে হাজার বছর ধরে কিছু না জেনে; শুধু বিশ্বাস করে। অনেক কিছুতেই হয়তো আমরা মানে খুঁজে পাই না; কিন্তু, এটি সত্য যে- ইসলামে অকল্যাণের কিছু নেই। অথচ, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আল-কুরআনে বহু আগে বলেছেন- 'আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে'। (সূরা বাকারা-২:১৮৪)।

কিডনী সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা রোযা রাখলে এ সমস্যা আরো বেড়ে যাবে ভেবে রোযা রাখতে চান না। অথচ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন- রোযা রাখলে কিডনীতে সঞ্চিত পাথর কণা ও চুন দূরীভূত হয়। এছাড়া, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে- সারা বছর অতিভোজ, অখাদ্য, কুখাদ্য, ভেজাল খাদ্য খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে যে জৈব বিষ জমা হয় তা দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এক মাস রোযা পালনের ফলে তা সহজেই দূরীভূত হয়ে যায়। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মেও বিভিন্ন ধরনের উপোস থাকার ধর্মীয় রীতির প্রচলন আছে। যেমন- অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানদের ক্যালোরি রেস্ট্রিকটেড ফাস্টিং, যেখানে দৈনন্দিন খাবারের ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়, অল্টারনেট ডে ফাস্টিং, যেখানে একদিন পরপর ২৪ ঘণ্টার জন্য পানি ব্যতীত সব ধরনের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হয়। অথচ, ইসলামে হাজার বছর ধরে রোযা পালিত হয়ে আসছে। রমযান শুধু আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য উপকারি তা নয়, বরং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

উপসংহার

ইসলামের প্রধান পাঁচটি রুকনের মধ্যে রোযা একটি। সালাত ও যাকাতের পরেই রোযার স্থান। ধনী-দরিদ্র সকলের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হলো।"

রোযা পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া মানে- আল্লাহকে ভয় করা, সব রকম পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা ও সংযম অবলম্বন করা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এ বিষয়ে বলেন, "যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

এটি আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়। রোযা পালনকালে যত লোভনীয় খাবার আসুক, সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুই খায় না। যেখানে দেখার মত কেউ নেই সেখানেও এক বিন্দু পানি পান করে না। বান্দা- ইবাদত হিসেবে একমাত্র রোযায় ফাঁকিবাজি করে না; সে পানির নিচে ডুব দিয়েও পানি পান করে না; সে মনে করে পানির নিচেও আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাকে দেখছে। এজন্যই আল্লাহ বলেন- "রোযা আমার জন্য; আর, আমি নিজে এর প্রতিদান দিব।" রোযাদার মুমিন ব্যক্তি কু-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীল কথা, খারাপ কাজ ও লোভ-লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এতে ব্যক্তি চরিত্র যেমন উন্নত হয়; তেমনি সুন্দর সমাজ গঠনেও সহায়ক হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা- তাঁর বান্দার রোযা ভঙ্গ হয় এমন কোনো কাজ করা হতে বিরত রাখুন; মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখুন এবং তাঁর বান্দার রমযানে নিয়মিত তারাবি আদায় করাসহ যথাযথভাবে রমযানের রোযা পালন করার তৌফিক দান করুন।

রেফারেন্সসমূহ:

১) রমযান ও রোযা- গুরুত্ব ও ফযিলত: মাওলানা মুহাম্মদ আনসারুল্লাহ হাসান; মাসিক আল-কাওসার;

২) রোযার গুরুত্ব ও তৎপর্য: কাজী ফারজানা আফরীন, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

৩) বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোজার গুরুত্ব ও উপকারিতা: মো: জিল্লুর রহমান, ইসলামী কলামিস্ট;

৪) ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা; এবং

৫) ফিকহী হানাফী।